ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশের অর্থনীতি

করোনা মহামারিতেও ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন অর্থনীতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে আরও সময় লাগবে। ক্ষতিগ্রস্থ খাতগুলোয় নীতি সহায়তাসহ প্রণোদনা প্যাকেজ দ্রুত বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়েছেন তারা। কোরবানি ঈদের আগে সরকারের নিষেধাজ্ঞা শিথিল ও গণপরিবহন সচল থাকায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা অর্থনীতির সব কর্মকান্ড শুরু হয়েছে। ফলে ক্রমেই গতি ফিরছে দেশের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে। হাসি ফুটছে ব্যবসায়ীদের মুখে। একইসঙ্গে রপ্তানি আয় ও বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এসেছে রেকর্ড পরিমান রেমিট্যান্স এবং পুঁজিবাজারে ফিরেছে গতি। করোনা অর্থনীতির নানা খাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করলেও তুলনামূলক শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও কৃষিখাত। অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধারে সরকারের বেশ কয়েকটি উদ্যোগ সহায়য়তা করেছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১,০৩,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা, রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও রেমিট্যান্স প্রবাহের সঙ্গে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি অর্থনীতিকে সচল রেখেছে। তবে রাজস্ব আয়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এখনও নেতিবাচক ধারায় রয়েছে। সে কারণে অর্থনীতি স্বাভাবিক গতিতে ফিরতে আরও সময় লাগবে। এজন্য করোনা মোকাবিলার ক্ষতিগ্রস্থ খাতগুলোয় নীতি সহায়তাসহ প্রণোদনা প্যাকেজ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

রেমিট্যান্সে রেকর্ড: করোনা ভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। গত বছরের জুলাই মাসের চেয়ে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৬৩%। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইতে প্রবাসীরা ২৬০ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। গত বছরের জুলাইতে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন ১৬০ কোটি ডলার। এই হিসেবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স বেড়েছে এক বিলিয়ন ডলারের মতো। একক মাস হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনও এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসেনি।

নতুন উচ্চতায় রিজার্ভ: রেমিট্যান্স প্রবাহ অব্যাহতভাবে বাড়ার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আগস্ট মাস শেষে ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সবোর্চ্চ রেকর্ড অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে যা এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত ৩০ জুন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩৬.০১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ইতিবাচক ধারায় রপ্তানি আয়: নতুন অর্থবছরের শুরুতেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের রপ্তানি খাত। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইতে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩৪৫ কেটি ডলার। অথচ এই খাতে আয় হয়েছে ৩৯১ কোটি ডলার। অর্থাৎ প্রথম মাসে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় বেড়েছে ১৩.৩৯%। একই সঙ্গে অর্জিত রপ্তানি আয় আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে বেড়েছে ০.৫৯%। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে রপ্তানি থেকে আয় হয়েছিল ৩৮৮ কোটি মার্কিন ডলার।

বাড়ছে আমদানি: করোনার মধ্যেও আমদানিতে ইতিবাচক ধারা দেখা যাচ্ছে। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় গত জুন মাসে আমদানিতে প্রায় ২৪% প্রবৃদ্ধি হয়েছে। যদিও গত অর্থবছরে আমদানি কমেছে প্রায় ৮.৫%।

পুঁজিবাজারে লেনদেনে উন্নতি: দীর্ঘদিন ধরে নিস্তেজ পুঁজিবাজারেও গতি ফিরেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) জুন মাসের চেয়ে জুলাইয়ে শেয়ার লেনদেন বেড়েছে। বেড়েছে নতুন বিনিয়োগও। জুন মাসে ৪,৭৮০ কোটি টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। সদ্য শেষ হওয়া জুলাই মাসে এই লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৬,০০০ কোটি টাকা। আর মূলধন বেড়েছে ১৩,৭৬৫ কোটি টাকা। সূচক বেড়েছে ২২৫ পয়েন্ট।

কৃষি ও সেবা খাত: করোনাকালে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বড় ভূমিকা রেখে চলেছে কৃষি। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ১৫.৪৪% অবদান কৃষি ও সেবা খাতের। কর্মসংস্থানেও বড় ভূমিকা রাখছে খাতটি। আয় কমে যাওয়ায় শহরত্যাগী মানুষগুলোকেও ধারণ করেছে গ্রামীণণ অর্থনীতি।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বাংলানিউজকে বলেন, "আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাড়ছে। আগের পর্যায়ে সহজে যাবে না। পৃথিবীর যেসব দেশ আমাদের চেয়ে ভালো আছে তাদেরও স্বাভাবিক অবস্থায় যেতে বছরখানেক লেগে যাবে। আমাদেরও সে সময় লাগবে। এখন অর্থনীতি টেকসই করা সরকারের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য কিছু নতুন উদ্যোগ নিতে হবে। এখন প্রবৃদ্ধি নিয়ে না ভেবে উৎপাদন, বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগ নিয়ে আগে ভাবতে হবে। রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আমাদের অর্থনীতিকে সহায়তা করছে। আমাদের নতুন করে রপ্তানি আদেশও আসছে। সবদিক বিবেচনায় আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি।" তিনি বলেন, "অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরাতে আরও কার্যকরভাবে করোনা মোকাবেলা করতে হবে। করোনার পর সুযোগ আসছে। এজন্য ব্যবসায়ী ও সরকারকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা যাদের পাওয়ার কথা তারা যাতে পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। যারা কাজ হারাচ্ছেন তাদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। ধীরে ধীরে উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোপুরি সচল করতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদা বাড়াতে হবে। "

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের গবেষক ড. জায়েদ বখত বাংলানিউজকে বলেন, "রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ার সুফল মিলবে পুরো অর্থনীতিতে। গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি খাত শক্তিশালী হলে ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনীতিকে টেনে তুলতে সাহায্য করবে। রেমিট্যান্স দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে সহায়তা করবে। ছোট ছোট উদ্যোক্তা তৈরি করবে। আর রপ্তানি আয় বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তা করবে।"

এদিকে ব্যবসায়ীরা বলছেন করোনা ভাইরাস মহামারির মধ্যেই কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল করে দেওয়ার মতো প্রধানমন্ত্রীর সাহসী সিদ্ধান্তের ফলেই দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকলেও উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু করেছেন। ঈদুল আজহার আগে দেশজুড়ে দোকানের বিক্রি বেড়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এছাড়া কোরবানি ঈদকে কেন্দ্র করে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ায় দেশের অর্থনীতির চাকা একটু হলেও সচল হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। পাশাপাশি রপ্তানি আয়ও বেড়েছে যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন বাংলানিউজকে বলেন, "ঈদুল আজহার সময় ১২,০০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়। এ বছর আমাদের মাত্র ৮০০ কোটি থেকে ১,০০০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। করোনার মধ্যে এই ঈদে কাঙ্ক্ষিত বিক্রি না হলেও আমরা আবার চালু করতে পেরেছি এটাই আমাদের স্বস্তি দিয়েছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। তিনি আমাদের কথা চিন্তা করে সাধারণ ছুটি শিথিল করেছেন। এতে করে আমরা ব্যবসা করতে না পারলেও বেঁচে থাকতে পারবো। তবে প্রণোদনা না পেলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের করুণ অবস্থা হবে। প্রায় এক কোটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর একটি বড় অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী বলেন, "সাধারণ ছুটির মধ্যেও কারখানা খুলে দেওয়ার মতো চ্যালেঞ্জিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুফল এখন রপ্তানি খাত পাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা, নীতিগত সহায়তা এবং শ্রমিকদের কাজে যোগ দেওয়ার আন্তরিকতাও প্রশংসা করার মতো। রপ্তানি খাত অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এই খাতের সঙ্গে আরও অনেকগুলো খাত সম্পৃক্ত। রপ্তানি খাত শক্তিশালী হলে অর্থনীতির অন্যান্য খাতও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।"

উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এরপর ১৮ মার্চ করোনায় প্রথম মৃতুর খবর দেয় সরকার। এ ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ২৬ মার্চ থেকে দফায় দফায় বাড়িয়ে টানা ৬৬ দিন সাধারণ ছুটি চলে। জরুরী সেবা, কাঁচাবাজার, নিত্যপণ্য ও ঔষধের দোকান ছাড়া সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকানপাট, শপিং মল খুলে দেওয়া হয়। এরপর গণপরিবহনও চালু করা হয়। সর্বশেষ ঈদুল আজহার আগে দোকানপাট ও বিপণিবিতান রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

করোনার ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশের অর্থনীতি

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের অর্থনীতি রপ্তানি ও প্রাবাসী আয়ের ওপর ভর করে ফের ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ব্যবসায়ীরা যেমনি শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করার আস্থা ফিরে পেয়েছে তেমনি সাধারণ মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে যুক্ত হচ্ছেন কাজে। একইসাথে পুরো করোনাকালীন সময়ে সচল থাকা কৃষিখাতে আরো প্রাণ চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পুঁজিবাজারে চাঙ্গাভাব, দোকান ও বিপণি বিতানে বেচা-কেনা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি আর্থিক খাতের বিভিন্ন সূচক অর্থনীতি ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসার সুস্পষ্ট আভাস দিচ্ছে। বৈশ্বিক ও দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর প্রশংসা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন করোনায় প্রাণহানির ঘটনা যদি বড় আকারে আর না ঘটে তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত পুনরুদ্ধার হবে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন করোনাভাইরাস অতিমারির মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার মত সাহসী সিদ্ধান্তের কারণে অর্থনীতির কালো মেঘ কেটে যাচ্ছে। পাশাপাশি ১ লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বাজারে নগদ অর্থের সরবরাহ সচল রেখে অর্থনীতি ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে সরকার গত ২৬ মার্চ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা বন্ধ এবং মানুষ ঘরবন্দি থাকায় অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক দূর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ৬৬ দিনের সাধারণ ছুটি শেষ হওয়ার পর অর্থনীতির চাকা আবার সচল হতে শুরু করে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন "সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে যে ব্যবসায় আস্থা বাড়তে শুরু করেছে। এর বড় কারণ হলো সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষিত ১ লাখ ০৩ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ যা নানাভাবে বাজারে নগদ অর্থ সরবরাহ করছে।" তিনি বলেন প্রণোদনা প্যাকেজের ৫০% হলো পুনঃঅর্থায়ন স্কীম। ব্যাংক রেটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে টাকা দিচ্ছে। এতে করে ব্যাংকগুলোর তারল্য পরিস্থিতি বেশ ভাল। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা বুঝেছেন তারা চাইলে টাকা পাবেন। এ সবে ব্যবসায়ীদের আস্থা আরো দৃঢ় হচ্ছে। ইতোমধ্যে বড় শিল্প-কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ঘোষিত ৩০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের ৫৫% ঋণ বিতরণ হয়েছে। আতিউর রহমান আরও বলেন রফতানিতে চাহিদা বাড়ছে, বিদেশিরা করোনায় সৃষ্ট নিউ নরমাল লাইফ মেনে নিয়ে ব্যবসাকেন্দ্র চালু করেছে। সামনে বড় দিন। তাই তৈরি পোশাক রফতানি বেড়েছে। ব্যবসায় আস্থা বৃদ্ধির আর এক কারণ হলো প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স প্রবাহের উল্লম্ফন। রেমিটেন্স বাড়লে যেটা হয় অর্থনীতিতে তারল্য বৃদ্ধি পায় যা পরোক্ষভাবে ব্যবসায়ীদের ব্যাংক ঋণ পেতে সহায়তা করে। যেটা এই মুহূর্তে আমাদের জরুরী প্রয়োজন।

চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রথম মাসে (জুলাই) রফতানি আয় করোনার ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে রফতানি হয়েছে ৩৯১ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য যা বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুলাই মাসের তুলনায় শুণ্য ০.৫৯% বেশি। এদিকে করোনা অতিমারির মধ্যে গত কয়েক মাস যাবৎ রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েই চলেছে। প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে রেমিটেন্স আয়ে রেকর্ড তৈরি হচ্ছে। সর্বশেষ গত জুলাই মাসে ২৬০ কোটি ডলারের রেমিটেন্স পাঠান প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশের ইতিহাসে এত বেশি রেমিটেন্স এর আগে কখনই আসেনি।

রফতানি আয় ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়ে রফতানিমূখী তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক ও ভারটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুনির হোসেন বলেন করোনা অতিমারির কারণে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে কমহারে পণ্য জাহাজীকরণ ও পশ্চিমা দেশগুলোতে ঘরবন্দি অবস্থা বিরাজ করায় রফতানি যথেষ্ট কম ছিল। এখন ওইসব দেশে বিপনী বিতান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছে। সামনে বড়দিন। তাই রফতানি ইতিবাচক ধারায় ফিরতে শুরু করেছে। তবে তিনি মনে করেন বড়দিন উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশে পোশাক পণ্য মূলত জুলাই ও আগস্টে জাহাজীকরণ হয়। সুতরাং জুলাই ও আগস্টে রফতানিতে যে প্রবৃদ্ধি দেখা যাবে সেই প্রবৃদ্ধি হয়ত আগামী মাসগুলোতে নাও থাকতে পারে। কিন্তু করোনার ধাক্কা কাটিয়ে রফতানিতে ইতিবাচক যে ধারা তৈরি হয়েছে সেটা বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির হিসাবে খুচরা পর্যায়ের ৯০% দোকান ইতোমধ্যে খুলেছে। তবে আড়ত বা বড় পরিসরের যেসব পাইকারি দোকান রয়েছে সেগুলো এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি। সংগঠনটির হিসাবে এবারের ঈদুল আজহায় ১২,০০০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। আর খুচরা পর্যায়ে বেচাকেনা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন জানান খুচরা পর্যায়ের অধিকাংশ দোকান ইতোমধ্যে খুলেছে। কোরবানির সময় বিক্রি ১০% বেড়েছে। তবে তিনি মনে করেন করোনার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এসএমইর জন্য ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা যদি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যথাযথভাবে না পান তাহলে তাদের একটি অংশ আর ব্যবসায় ফিরে আসতে পারবেন না। এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সরকার ২০,০০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যকেজ ঘোষণা করে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি শামস মাহমুদ মনে করেন গত এক মাসে অর্থনীতিতে খানিকটা প্রাণ চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পর্যটন ও হোটেল ছাড়া অন্যান্য সেবা খাতে মানুষ কাজে ফিরতে শুরু করেছে। তিনি বলেন করোনা অতিমারিতে যারা কর্মহীন হয়েছে তাদের কর্মসংস্থানে ফিরিয়ে আনা একটা চ্যালেঞ্জ। এর জন্য এসএমই খাতকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে উজ্জীবিত করার প্রতি সরকারের মনোযোগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

এদিকে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড (স্ট্যানচার্ট) ব্যাংক গত ১২ আগস্ট এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয়ের হাত ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ব্যবসায়ীরাও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেছেন। ব্যাংকটি এও বলেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি বাংলাদেশ দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে পারবে। আর রেমিটেন্স বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে। ফলে আমদানি ব্যয় মেটানো নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

স্ট্যানচার্টেও প্রধান অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড লি বলেছেন আশিয়ান ও দক্ষিণ এশিয়ার দুইটি দেশ ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে। বাংলাদেশ এর মধ্যে একটি। এখন বাংলাদেশ ব্যবসায় অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠেছে। অন্যদিকে দেশীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) এক জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছে করোনা অতিমারির দ্বিতীয় প্রান্তিকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে শুরুর দিকের তুলনায় ব্যবসা পরিচালনার আস্থা বেড়েছে।

আতিউর রহমানের অভিমত বাংলাদেশের কৃষিখাত বরাবর ভালো করে। এবারও করোনা অতিমারির শুরু থেকে কৃষি সচল ছিল। প্রণোদনা প্যাকেজ ছাড়াও সার, বীজসহ পর্যাপ্ত কৃষি উপকরণ বিতরণ করায় কৃষিতে এখন আরো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত পুনরুদ্ধার বা করোনার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে বড় সহায়তা করছে।

কমনওয়েলথ সচিবালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক মনে করেন কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার মত সাহসী সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্য ভাল ছিল। তিনি বলেন করোনায় যদি বড় আকাওে প্রাণহানি না ঘটে তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত পুনরুদ্ধার হবে। তিনি করোনায় সৃষ্ট বৈশ্বিক বাণিজ্যিক সুবিধা বিশেষ করে চীন থেকে স্থানান্তরিত বিনিয়োগ বাংলাদেশে আনার বিষয়ে সরকারকে আরো তৎপর হওয়ার পরামর্শ দেন।

ঈদুল আজহার ছুটির পর থেকেই চাঙ্গাভাব দেখা যাচ্ছে দেশের পুঁজিবাজারে যা স্পষ্টত অর্থনীতি দ্রুত পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত বহন করছে। দেশের দুই পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচক ও লেনদেন উভয়ই বেড়ে চলেছে। এর পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণও বাড়ছে।

অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে: সর্বক্ষেত্রে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে

সাধারণ ছুটি তুলে নেওয়ার পর গলির দোকান থেকে শুরু করে বড় শিল্পকারখানা সবই এখন চালু হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি, উৎপাদন, সরবরাহ, বিপণন, উন্নয়ন কর্মকান্ড ও পরিবহন চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়েছে। স্থবির হয়ে পড়া অর্থনীতির চাকাও আবার ঘুরছে। ঘুরে দাঁড়াচ্ছে অর্থনীতি। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনার আগের মতো সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে, সেটা বলা পুরোপুরি সঠিক হবে না। অর্থনীতি পুরোপুরি পুনরুদ্ধারে আরও সময় লাগবে বলে মনে করছেন অর্থনীতি বিশ্লেষকরা। অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা বলছেন ভাইরাসের ভয়ে মানুষ আর ঘরে বসে নেই। জীবন থেমে থাকে না। সারাবিশ্বই ধীরে ধীরে কর্মমুখর হয়ে উঠছে। বাংলাদেশেও কর্মচঞ্চল হয়েছে অফিস-আদালত, শিল্পকারখানা। সর্ব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ফলে অর্থনীতি গতিশীল হচ্ছে। তবে ভাইরাসের টিকা সবার জন্য নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে বলে তারা মনে করেন।

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে প্রায় তিন মাস সাধারণ ছুটি থাকায় অফিস-আদালত, বিপণিবিতান, হোটেল-রেস্তোরা, পর্যটন ও পরিবহন বন্ধ ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও বন্ধ রয়েছে। এতে রিকশা ও অটোরিকশা চালক, গণপরিবহন শ্রমিক, ফুটপাতের ব্যবসায়ী, হকার, চায়ের দোকানদারসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়ে পড়েন। অনেকে শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে যান। হোটেল-রেস্তোরা, বেকারি, পর্যটন, এমনকি বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানও কার্যক্রম বন্ধ করে কর্মীদের ছুটিতে পাঠায়। বৈশ্বিক যোগাযোগ ভেঙে পড়ায় আমদানি-রপ্তানিও আশঙ্কাজনকভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। শিল্পোৎপাদন কমে যায়। এতে কৃষি, শিল্প ও সেবা তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে এক ধরনের স্থবিরতা দেখা দেয়। মানুষের আয় কমে যায়। বাড়তে থাকে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য।

কৃষি খাতঃ করোনা বিস্তার রোধে শিল্প, সেবা খাতে স্থবিরতা দেখা দিলেও দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তি কৃষি খাতে তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি। করোনাকালেও স্বাভাবিকভাবে চলেছে কৃষি খাতের কর্মকান্ড। প্রধান প্রধান ফসল, গবাদি পশু, মাছের উৎপাদন ও বিপণনে সমস্যা হয়নি। ফলে দেশের ১৭ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটাতে যেমন কোনো চাপ সৃষ্টি হয়নি, তেমনি গ্রামীণ অর্থনীতিও ভেঙে পড়েনি। তবে ঘূর্ণিঝড় আম্পান, জুলাই-আগস্ট সময়ের অতিবৃষ্টি, পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢল ও নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা এবং নদীভাঙনের কারণে আউশ, আমন ধান, পাট, শাকসবজি, মসলা এবং গাছপালা ও পশুপাখির ক্ষতি হয়েছে। এরপরও কৃষি মন্ত্রণালয় আশা করছে কৃষিপণ্যের উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাবে।

গত ৩ আগস্ট সাধারণ ছুটি তুলে নেওয়ার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। মানুষ স্বাভাবিক সময়ের মতো ঘর থেকে বের হচ্ছে। কাজ করছে। রাজধানী ঢাকাসহ অন্য শহরগুলো আগের চেহারায় ফিরেছে। সড়কে যানজট দেখা যাচ্ছে। সেই আগের মতো দোকান বসছে ফুটপাতে। চায়ের স্টল, কফি শপ, হোটেল-রেস্তোরা চালু হয়েছে। ভিড় বাড়ছে পর্যটন কেন্দ্রে। আমদানি করা নতুন পণ্য নিয়ে জাহাজ ভিড়ছে বন্দরে। আবার অনেক জাহাজ রপ্তানি পণ্য নিয়ে বন্দর ছেড়ে যাচ্ছে বিদেশে। ফলে অর্থনীতিও জেগে উঠছে।

পর্যটন খাতঃ করোনার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ পর্যটনও জেগে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে মানুষ বেড়াতে যাচ্ছেন। সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমছে। আবার জমজমাট হচ্ছে বিনোদনকেন্দ্রগুলো। হোটেল-মোটেলগুলোতে ফিরছেন অতিথিরা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন দীর্ঘদিন লকডাউনে থেকে মানুষের মনে এক ধরনের অবসাদ দেখা দিয়েছিল। সবকিছু চালু হওয়ার পর মানুষ বেড়াতে বের হচ্ছেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। এ বিষয়ে কক্সবাজারের কলাতলী নিউ সি বিচের হোটেল সি ক্রাউনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক বর্ষণ চৌধুরী বলে সম্প্রতি পর্যটকরা আসছেন। এপ্রিল-মে মাসে যেমন একেবারেই পর্যটক ছিল না, সে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। এখন কক্সবাজারের হোটেলগুলোতে কমবেশি অতিথি আছেন। এদিকে, পর্যটনের অন্যতম অনুষঙ্গ বিমান চলাচলও শুরু হয়েছে।

পরিবহন চালু হয়েছে পুরোদমে। রাজধানীতে আবার সেই ব্যস্ততা বা যানজট ফিরে এসেছে। এতে জ্বালানি তেলের চাহিদা বেড়েছে। বিপিসি জানিয়েছে, বর্তমানে ১১ হাজার টন জ্বালানি তেল বিক্রি হচ্ছে দৈনিক। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। তবে আয় বাড়েনি বিশেষ। মতিঝিলে ফুটপাতের পাশে চায়ের দোকানি বাবুল মিয়া সমকালকে বলেন, অফিস ও ব্যবসা সবই বন্ধ ছিল। মতিঝিলে তো লোকই আসত না। দোকানও বন্ধ ছিল। কোরবানির ঈদের পরে লোকজন আসছে, দোকান নিয়মিত খোলা থাকছে। শহরের শপিং মল, বিপণিবিতানগুলো খুলেছে বেশ আগেই। আগের মতো না হলেও কেনাবেচা শুরু হয়েছে। কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে।

এদিকে, বাজারে মাস্ক, পিপিই, ঔষধ, অক্সিজেন, অক্সিজেন মাপার যন্ত্র, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, বাইসাইকেল, মোটরসাইকেলের বেচাকেনা বেড়েছে বেশ। আবার ইন্টারনেটের পেছনে মানুষের খরচ বেড়েছে, যা ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে সামান্য হলেও স্বস্তি দিয়েছে। অন্যদিকে করোনাভাইরাসের কারণে গত ছয় মাস ধরে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোচিং সেন্টার পুরোপুরি বন্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এ খাতের পরিবহন, শিক্ষা উপকরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন চাহিদার অন্যান্য পণ্যের ব্যবসাও তেমন একটা হচ্ছে না।

নর্থ বেঙ্গল সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক আন্দালিব হাসান বলেন ঈদুল আজহার পরে তাদের কারখানা প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। পরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়েছে। সবকিছু আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে। অনেক পশ্চিমা দেশের তুলনায় ভালোভাবে শুরু করতে পেরেছে বাংলাদেশ। তবে এতে খুব খুশি হওয়ার কিছু নেই। এখনও সতর্ক থাকতে হবে।

শিল্পকারখানাগুলো চালু হয়েছে। তৈরি পোশাক, স্টিল, রড, সিমেন্ট, চামড়া, পাট, আসবাবপত্র, সিরামিক, ঔষধ, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, বেকারি পণ্যের কারখানা চলছে জোরেশোরে। দেশের বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী প্রাণ আরএফএল গ্রুপের পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল সমকালকে বলেন মানুষজন ঘর থেকে বের হচ্ছেন। কাজ করছেন। দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন চলছে। ফলে বাজারে চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু যে গতিতে চাহিদা বাড়ার কথা ছিল তেমন বাড়েনি। তবে দুই বা তিন মাসের আগের তুলনায় অবশ্যই ভালো। ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতার দিকে এগোচ্ছে অর্থনীতি। তবে পূর্ণ স্বাভাবিক হতে কত সময় লাগবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। ক্যাপিটাল বিস্কুট কোম্পানির মালিক ও ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ বশিরউদ্দীন সমকালকে বলেন, মার্চের পর থেকে খুবই সীমিতভাবে তিনি বেকারির উৎপাদন চালিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি চাহিদা কিছুটা বাড়ায় উৎপাদনও বাড়ানো হয়েছে। তবে পুরোদমে কাজ করা যাচ্ছে না।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি): অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সম্প্রতি সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) গতি পেয়েছে। আইএমইডির তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে এডিপি কার্যক্রমে ৩,২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো। এতে রড, সিমেন্ট, ইট, বালুসহ নির্মাণ সামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে। জুলাই-আগস্ট সময়ে রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের চেয়ে বেশি হয়েছে। সর্বশেষ আগস্ট মাসে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ২.১৭% বেশি রপ্তানি আয় এসেছে বলে জানিয়েছে ইপিবি। অন্যদিকে বেসরকারি খাতের ঋণে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সর্বশেষ জুলাই মাসে বেসরকারি খাতের ঋণে আগের বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ৯.২০% প্রবৃদ্ধি হয়েছে। যদিও অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর মনে করছেন এই প্রবৃদ্ধির পেছনে ঋণ আদায় ও খেলাপি করার ক্ষেত্রে নীতিমালায় পরিবর্তন আনা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার যেসব প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তার প্রভাব কাজ করেছে। তবে বাজারে চাহিদার কারণে এনজিওগুলোর ঋণ বিতরণ বেড়েছে। এ সময়ে বিদেশ থেকে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী গত জুলাই ও আগস্ট মাসে ৪৫৬ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫০% বেশি। রেমিট্যান্সের এই অর্থ অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করছে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর সমকালকে বলেন করোনা সংক্রমণকে এখন আর মানুষ সংকট হিসেবে দেখছে না। মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। অনেক কাজকর্ম হচ্ছে। ফলে ধীরে ধীরে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সেটা এমন নয় যে সবকিছু আগের মতো হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। এপ্রিল, মে, জুন মাসে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কেটে যাচ্ছে। কিন্তু অর্থনীতি করোনার আগের অবস্থায় আসতে আরও সময় লাগবে। কারণ মানুষ ঘর থেকে বের হলেও রোজগার আগের অবস্থায় নেই। তবে অর্থনীতির যে পতন হচ্ছিল অর্থাৎ বেকারত্ব, দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়া সেটা হয়তো আর বাড়বে না।

ওনার গ্রুপের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান সমকালকে বলেন পর্যায়ক্রমে কার্যক্রম হচ্ছে। তবে মানুষের মধ্যে ভয় এখনও রয়েছে। এখনও অনেকে ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। বলতে হবে একটু একটু করে শুরু হচ্ছে। পুরোপুরি ঠিক হতে দেড় থেকে দুই বছর লাগতে পারে। তিনি বলেন কৃষিভিত্তিক ব্যবসা পুরোদমে চলছে। আবার করোনার কারণে নতুন কিছু ব্যবসা দেখা দিয়েছে। ফলে অর্থনীতি শ্লথগতি হলেও ভেঙে পড়বে না। তিনি জানান এপ্রিল-মে সময়ে রানার গ্রুপের সব অফিস বন্ধ ছিল। মে মাসের একেবারে শেষে স্বল্প পরিসরে কারখানা ও অন্যান্য অফিসে কাজ শুরু হয়। এখন কার্যক্রম বাড়লেও পুরোদমে কাজ হচ্ছে না। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে সবাই একসঙ্গে অফিস করতে পারছেন না।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগে নতুন দুয়ার খুলছে

চীন ১৪০ কোটি মানুষের বিশাল সম্ভাবনাময় বাজার আর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। সম্প্রতি বাংলাদেশকে চীন তার বাজারে ৮,২৫৬টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। এই সুবিধার কারণে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন করে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আগামী অর্থবছরের শুরতেই এই সম্ভাবনা দৃশ্যমান হবে বলে আশা সংশ্লিষ্ট মহলের।

অন্যদিকে বাংলাদেশে শ্রম মজুরি কম এবং নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা থাকায় এরই মধ্যে চীনের অনেক উদ্যোক্তা বাংলাদেশে কারখানা স্থানান্তরের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন করে সেই পণ্য নিজ দেশে রপ্তানি করবেন।

ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠন সূত্রে জানা গেছে চীনের বাজারে যেসব পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা আছে তার ৯৭ শতাংশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশও এ সুবিধা পাবে। ১ জুলাই থেকে এটা কার্যকর হওয়ার কথা। তবে চীনের পাঠানো পণ্যের তালিকা সে দেশের ভাষায় হওয়ায় তাতে কী কী পণ্য আছে তা চূড়ান্ত করা যায়নি। বর্তমানে অনুবাদ নিয়ে কাজ করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই) ও বাংলদেশে চীনের দূতাবাস।

এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান কালের কণ্ঠকে বলে চীন শুল্ক সুবিধা দিলেও এসব সুবিধা পেতে কিছু শর্ত রয়েছে। এসব শর্তসহ সুবিধাদি নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে কিভাবে এই সুযোগ কাজে লাগানো যায়। চীনের বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলে 'দেশটির অনেক বিনিয়োগকারী এখন বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছে। তাদের আমরা বাংলাদেশে কারখানা স্থানান্তরের আহ্বান জানাচ্ছি। বিপুল সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। তবে চীনের দেওয়া রপ্তানি সুবিধা ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা দৃশ্যমান হতে অপেক্ষা করতে হবে আগামী অর্থবছর পর্যন্ত।"

উদ্যোক্তারা জানান, চীনের বাজারে পণ্য রপ্তানির জন্য সরকার তৈরি পোশাক, ঔষধ, আসবাব, চামড়া, চামড়াজাত পণ্যে নগদ সহায়তা দিচ্ছে। এ ছাড়া পণ্য বহুমুখীকরণে সব ধরনের সহযোগিতা করছে। প্রতিযোগিতা করেই বিশ্বের ১৪০টি দেশে পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। চীনেও পারবেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। তাঁরা বলেন, চীন তার বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে সুবিধা দিয়েছে তা কার্যকর হলে মিঠা পানির মাছ, পাট, সামুদ্রিক মাছ, প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি বিশেষভাবে বিবেচিত হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশ যারা শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় না তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে সেটা চীনের বাজারে রপ্তানি করতে পারবে।

বিসিসিসিআই সূত্রে জানা যায় বাংলাদেশের মোট আমদানির ৩৪% আসে চীন থেকে। ১,৪০০ কোটি ডলারের আমদানির বিপরীতে বাংলাদেশ রপ্তানি করে ১০০ কোটি (এক বিলিয়ন) ডলারের কম। গত অর্থবছরে (২০১৯-২০২০) চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১১ বিলিয়ন ডলারের বেশি। ওই অর্থবছরে চীন বাংলাদেশে প্রায় ১১৬ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। সংগঠনটি জানায়, চীনের রোড অ্যান্ড বেল্ট উদ্যোগে বাংলাদেশ যোগদানের পর থেকে বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ বেড়েই চলছে। এ ছাড়া ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে সফরের সময় ২৪ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি হয়। এটা একক কোনো দেশ হিসেবে বড় বিনিয়োগের অঙ্গীকার ছিল। এ ছাড়া চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে চীনের একটি বড় কেমিক্যাল কম্পানিকে ১০০ একর জমি দিয়েছে বাংলাদেশ। আরো বহু কোম্পানি পাইপলাইনে আছে।

বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা কালের কণ্ঠকে বলেন 'করোনার কারণে চীন বাংলাদেশের অবাধ যাতায়াতের সুযোগ না থাকায় চীনের দেওয়া সুবিধা দৃশ্যমান হচ্ছে না। তবে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ আগের তুলনায় বেড়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডা বাংলাদেশ চায়না চেম্বার এই নিয়ে কাজ করছে।" চীনের বিনিয়োগ আনতে চেষ্টা চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন এরই মধ্যে দেশটির দুটি বড় প্রতিষ্ঠান বায়োটেকনোলজি ও ইলেকট্রিক ভেহিকলের জন্য বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। আরো চার থেকে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে বিডা ও চেম্বার একসঙ্গে কাজ করছে।

তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম কালের কণ্ঠকে বলেন, তৈরি পোশাক খাতের বিশ্ববাজার ৪৫০ বিলিয়ন ডলারের যার মধ্যে চীনের রপ্তানির পরিমাণ ১২৮ বিলিয়ন ডলার বা বাজারের ৩৫%। চীনের বাজারের ২ শতাংশও যদি বাংলাদেশ পায় তবে আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে ৫০০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি বাড়বে। তিনি বলেন, গত বছর চীনে ৫১ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। তবে করোনার কারণে চলতি বছরের গত আট মাসে আয় কম হয়েছে। এ সময় আয় হয়েছে ৩৩ কোটি ডলার।

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের পরামর্শ দিয়ে অর্থনীতিবিদরা বলছেন শুল্কমুক্ত সুবিধায় চীনসহ বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানি করতে চায় বিদেশি বিনিয়োকারীরা। এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য তাদের পছন্দের তালিকায় আছে বাংলাদেশ। সনি মোবাইল ও স্যামসাংয়ের মতো কম্পানি চীন থেকে সরে যাচ্ছে। তবে চীনের বিনিয়োগ পেতে হলে বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামোর কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। শুধু পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে নির্ভরতা কাটিয়ে পণ্য বহুমুখীকরণ করতে হবে। তাহলেই চীনের শুল্কমুক্ত সুবিধা কাজে লাগানো যাবে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান কালের কণ্ঠকে বলেন "চীনের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধার ফলে দেশের অর্থনীতির জন্য তিনটি বড় সুযোগ তৈরি হলো। চীনে আমাদের পোশাকসহ প্রধান রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ হলো। এতে করে বাংলাদেশের জন্য সহজে পণ্য রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার সুযোগ তৈরি হলো। এ ছাড়া চীন এবং অন্য দেশের বিনিয়োগকারীরা এখানে তাঁদের পণ্য তৈরি করে চীনে শুল্কমুক্ত সুবিধায় রপ্তানি করে লাভবান হবেন।" তৌফিকুল ইসলাম খান আরো বলেন চীনে মাসিক ন্যূনতম মজুরি ৩০০ ডলার যা বাংলাদেশে মাত্র ১০০ ডলার অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের মতো। ভিয়েতনামে ২০০ ডলার। ফলে চীনে পণ্য উৎপাদন অনেক ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। তাই চীনা উদ্যোক্তারা অন্য দেশে কারখানা স্থাপনে আগ্রহী বেশি। আর এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে বাংলাদেশকে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) সূত্রে জানা গেছে দুই বছর ধরে চীনের অনেক কম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আলোচনা চালাচ্ছে। বর্তমানে চীন বাংলাদেশের পদ্মা সেতু, পায়রা বন্দরসহ নানা অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া চট্টগ্রামে কর্ণফুলীর নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ, চট্টগ্রাম ও খুলনায় বড় দুটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নির্মাণের সঙ্গেও চীন সম্পৃক্ত। চীন এরই মধ্যে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শাহজালাল সার কারখানা ও বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র। এছাড়া বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং টেলিযোগাযোগ খাতে চীনের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো জড়িত।

করোনা মহামারীতে বিপর্যয় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পোশাক খাত: বিদেশি ক্রেতারা আসছেন

বাতিল ও স্থগিতাদেশ হওয়া পোশাকের ক্রয়াদেশের পণ্য নিতে শুরু করেছেন বিদেশি ক্রেতারা। আবার নতুন করে আসছে ক্রয়াদেশও। এরই মধ্যে অনেক কারখানাতেই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ করার মতো পর্যাপ্ত ক্রয়াদেশ চলে এসেছে। ফলে করোনাভাইরাসের শুরুর দিকে বিপর্যস্ত রপ্তানি আয়ের শীর্ষ খাতটি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমানে যে পরিমাণ ক্রয়াদেশ আসছে সেটিকে অবশ্য মন্দের ভালো বলছেন পোশাকশিল্পের মালিকেরা। অন্তত আটজন কারখানামালিক জানান গতবারের তুলনায় বর্তমানে ৭০-৮০% ক্রয়াদেশ আসছে যা বর্তমান পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে সাহস জোগাচ্ছে। অনেকগুলো বড় ব্র্যান্ড স্থগিত ও বাতিল করা ক্রয়াদেশের পণ্য আবার নিতে শুরু করায় পোশাক রপ্তানি গত জুনে বেশ খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তবে বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস ও টিকা আবিষ্কার না হওয়ায় একধরনের অনিশ্চয়তা এখনো রয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে গত মার্চে সেখানকার বড় ক্রেতারা একের পর এক ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত করতে থাকেন। এদিকে দেশেও ভাইরাসটির সংক্রমণ রোধে ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর মাসখানেক পোশাক কারখানা বন্ধ ছিল। তাতে এপ্রিল মাসে মাত্র ৩৭ কোটি মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয় যা গত দুই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। পরের মাসে রপ্তানি হয় ১২৩ কোটি ডলারের পোশাক। জুনে সেটি বেড়ে ২২৫ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপরও বিদায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২,৭৯৫ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয় যা তার আগের বছরের চেয়ে ৬১৮ কোটি ডলার কম। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের প্যাসিফিক জিনস গ্রুপের পাঁচটি কারখানা রয়েছে। করোনা সংক্রমণের মধ্যেও সদ্য বিদায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তারা রপ্তানি করেছে প্রায় ৪০ কোটি ডলারের পোশাক। তার আগের অর্থবছরের চেয়ে তাদের রপ্তানি কমেওনি এবং বাড়েওনি। জানতে চাইলে প্যাসিফিক জিনসের পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর প্রথম আলোকে বলেন "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে বিক্রয়কেন্দ্র খোলার পরপরই ক্রেতারা ক্রয়াদেশ দিতে শুরু করেছেন। আমাদের কারখানায় গতবারের চেয়ে বর্তমানে ৬০-৭০% ক্রয়াদেশ রয়েছে।' তিনি বলেন, সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ক্রয়াদেশ আছে। তারপরের ক্রয়াদেশও আসছে। তবে আসার গতিটা কম। অনেক সময় ক্রেতারা কারখানা বুকিং দেওয়ার পরও নানা কারণে শেষ পর্যন্ত ক্রয়াদেশ দেন না। ফলে কিছুটা অনিশ্চয়তা তো আছেই। এদিকে করোনায় একেবারে ক্রয়াদেশ কমেনি এমন কারখানার খোঁজও পাওয়া গেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুরোনো এক উদ্যোক্তা জানান সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্রয়াদেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই তাঁর। গতবারের মতোই ক্রয়াদেশ রয়েছে কারখানায়। করোনায় ক্রয়াদেশ তো কমেনি বরং নতুন দুটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ক্রয়াদেশ পেয়েছেন তিনি।

পোশাক খাতের আরেক বড় প্রতিষ্ঠান ঢাকার রাইজিং গ্রুপ। তাদের পোশাক কারখানার সংখ্যা ৭টি। ওয়ালমার্ট, ইন্ডিটেক্স, প্রাইমার্ক, টার্গেট, কিয়াবি, কে-মার্টের মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের পোশাক তৈরি করা রাইজিং গ্রুপের রপ্তানির পরিমাণ বছরে ১৩ কোটি ডলার। রাইজিং গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহমুদ হাসান খান প্রথম আলোকে বলেন "আমাদের সাতটি কারখানার মধ্যে ছয়টিতে ভালো ক্রয়াদেশ আসছে। সব মিলিয়ে গতবারের তুলনায় ক্রয়াদেশের পরিমাণ ৮০ শতাংশের কাছাকাছি। তা ছাড়া মার্চে বাতিল ও স্থগিত হওয়া সব ক্রয়াদেশের পণ্য ক্রেতারা নিতে শুরু করেছে। যদিও একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে ৪ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যছাড় দিতে হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, 'করোনার শুরুর দিকে ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হওয়ায় আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। তবে বর্তমানে ক্রয়াদেশ আসার হার দেখে ভরসা পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমরা টিকে যেতে পারব।"

উদ্যোক্তারা গতবারের তুলনায় ৭০-৮০% ক্রয়াদেশ প্রাপ্তির যে কথা বলছেন তার সঙ্গে রপ্তানি আয়ের চিত্রও মিলে যাচ্ছে। পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ গত বুধবার জানিয়েছে ০১ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত ৯৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ১১৯ কোটি ডলারের পোশাক। মার্চে পোশাকের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হওয়ায় মালিকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে সরকার রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। সেই তহবিল থেকে প্রায় ১,৮০০ কারখানার মালিক মাত্র ২% সেবা মাশুলে ঋণ নিয়ে তিন মাসের মজুরি দিয়েছেন। অন্যদিকে দুই মাসের ব্যবধানে পোশাক রপ্তানিতে গতি ফিরলেও ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করেছেন পোশাকশিল্প উদ্যোক্তারা। এপ্রিলে কারখানা বন্ধ থাকাকালে ৬৫% মজুরি দিয়েছেন। এমনকি শ্রমিকদের ঈদ বোনাসেও হাত দিয়েছেন অধিকাংশ মালিক।

বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী করোনায় ৩১৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানির ক্রয়াদেশ প্রাথমিকভাবে বাতিল ও স্থগিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রাইমার্ক ৩৩ কোটি, ইন্ডিটেক্স ৮ কোটি ৭০, বেস্টসেলার ৮ কোটি ৩০ লাখ, মাদারকেয়ার ৫ কোটি ৬০ লাখ, কোহলস ৫ কোটি ৪০ লাখ, গ্যাপ ৩ কোটি ৮০ লাখ, জেসি পেনি সাড়ে ৩ কোটি, ওয়ালমার্ট ১ কোটি ৯০ লাখ, ডেবেনহাম ১ কোটি ৮০ লাখ ও রালফ লরেন ১ কোটি ডলারের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত করে। পরবর্তী সময়ে নানামুখী চাপের কারণে অধিকাংশ ক্রেতাই পণ্য নিতে সম্মত হন। তবে অর্থ পরিশোধে ছয় মাস পর্যন্ত সময় চান অনেকে। সর্বশেষ ২ জুলাই লেভি স্ট্রজ ও তার কয়েক দিন পর গ্যাপ ইনকরপোরেশন বাতিল করা ক্রয়াদেশের পোশাক পূর্ণ দাম দিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ফলে ব্র্যান্ড দুটির ৩০-৪০টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন। বাংলাদেশি পোশাকের অন্যতম বড় ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এইচঅ্যান্ডএম। সুইডেন-ভিত্তিক এই ব্র্যান্ড বাংলাদেশ থেকে বছরে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার বা ২৫,৫০০ কোটি টাকার পোশাক কিনে থাকে। সেই হিসাবে ১০% বাংলাদেশি পোশাকের ক্রেতা হচ্ছে এইচঅ্যান্ডএম। করোনায় কোনো ক্রয়াদেশ বাতিল করেনি তারা। স্থগিত হওয়া ক্রয়াদেশের পণ্য নেওয়া শুরুর পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের কাছে কোনো মূল্যছাড়ও চায়নি। পোশাকের ক্রয়াদেশের দাম পরিশোধের শর্তেও কোনো রকম পরিবর্তন করেনি এইচঅ্যান্ডএম। জানতে চাইলে এইচঅ্যান্ডএমের বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইথিওপিয়ার প্রধান জিয়াউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন "গত দুই থেকে আড়াই মাসে আমরা ৫০ কোটি ডলারের ক্রয়াদেশ দিয়েছি। আমাদের ৩০০ সরবরাহকারী কারখানার সবাই ক্রয়াদেশ পেয়েছে। এইচঅ্যান্ডএমের ক্রয়াদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান ভালো। চীন ও তুরস্ক থেকে যেসব ক্রয়াদেশ সরছে তার একটি অংশ বাংলাদেশে আসছে। কারণ বাংলাদেশে উৎপাদন খরচ তুলনামূলক কম।"

আগামী দুই-তিন মাসের পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে চাইলে জিয়াউর রহমান আরও বলেন "লকডাউনের পর বিক্রয়কেন্দ্র খুলেছে। কোনো কোনো দিন ভালো বিক্রি হচ্ছে। আবার কোনো দিন হচ্ছে না। ফলে প্রতি সপ্তাহে পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হচ্ছে। তা ছাড়া লকডাউনের কারণে স্টক জমে গেছে। আমরা সেগুলো নিয়ে কাজ করছি। ফলে আগামী কয়েক মাস ক্রয়াদেশ কী পরিমাণ দেওয়া হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।' বাংলাদেশি পোশাকের আরেক বড় ক্রেতা যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক ব্র্যান্ড মার্ক্স অ্যান্ড স্পেনসার (এমঅ্যান্ডএস)। ব্র্যান্ডটির ১,৪৬৩ বিক্রয়কেন্দ্রে গত বছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০০ কোটি ডলারের পোশাক গেছে। বর্তমানে এমঅ্যান্ডএসের পোশাক তৈরি করে দেশের ৫৫ জন সরবরাহকারী। কারখানার সংখ্যা ৮৩। জানতে চাইলে এমঅ্যান্ডএসের বাংলাদেশ প্রধান স্বপ্না ভৌমিক প্রথম আলোকে বলেন "করোনায় আমরা কাজের ধরন বদলে ফেলেছি। বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি যে পরিমাণে হচ্ছে সেই পরিমাণে ক্রয়াদেশ দিচ্ছি। নতুন ক্রয়াদেশের বেলায় আট সপ্তাহের বেশি সময় দিচ্ছি না। দ্রুত সরবরাহ করতে স্থানীয়ভাবে পোশাকের অনুমোদন দিতে শুরু করেছি আমরা। সেই সঙ্গে চীন থেকে কৃত্রিম তন্তুর সুতা আমদানি করে দেশেই কাপড় উৎপাদনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে গতবারের চেয়ে ৭০-৮০ শতাংশ ক্রয়াদেশ পাচ্ছে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।' করোনার শুরুর দিকে প্রস্তুত হওয়া পোশাকের বেশির ভাগই নেওয়া শেষ। প্রস্তুত হওয়া কিছু পণ্য পরে জাহাজে উঠবে। সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের কাঁচামালের অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এমন তথ্য দিয়ে স্বপ্না ভৌমিক বলেন উদ্যোক্তারা বর্তমান চ্যালেঞ্জের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিচ্ছেন। ফলে শিগগিরই বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি খাত ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

দেশের পোশাক রপ্তানিতে আরেক বড় প্রতিষ্ঠান এনভয় গ্রুপ। ১৯৮৪ সালে শুরু করা গ্রুপটির অধীনে রয়েছে ১৫টি পোশাক কারখানা। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিখ্যাত জারা, নেক্সট, সিঅ্যান্ডএ, কেলভিন ক্লেইন, আমেরিকান ইগল, ওয়ালমার্ট, ডিজনিসহ বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ডের জন্য পোশাক সরবরাহ করে প্রতিষ্ঠানটি। এনভয় গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুস সালাম মুর্শেদী প্রথম আলোকে বলেন যেসব ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হয়েছিল সেগুলো ক্রেতারা নিচ্ছেন। অন্যদিকে নতুন ক্রয়াদেশ আসার যে প্রবণতা রয়েছে সেটিও ইতিবাচক। যদিও জুলাই-আগস্ট লিংক পিরিয়ড, প্রতিবছরই মাস দুটিতে ক্রয়াদেশ কিছুটা কম থাকে। তিনি বলেন সরবরাহকারীদের কাছে ক্রয়াদেশের চাহিদা বেশি থাকায় বর্তমানে বেশ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। তাতে কিছু ক্রেতা গতবারের চেয়ে কম দাম দিচ্ছেন। তবে অধিকাংশই আগের দামে ক্রয়াদেশ দিচ্ছেন।

সাধারণ ছুটির মধ্যে কারখানা খুলে দেওয়ার মতো চ্যালেঞ্জিং সিদ্ধান্ত এবং শ্রমিকদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারায় পোশাক রপ্তানি ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী। তিনি বলেন বড় কারখানাগুলো টিকে থাকার মতো ক্রয়াদেশ পেলেও ছোট ও মাঝারি কারখানা সেভাবে পাচ্ছে না। তাই অন্তত দুই মাস তাদের শ্রমিক-কর্মচারীর মজুরির জন্য সহায়তা দরকার। জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের মজুরি দেওয়ার জন্য গত মাসে নতুন করে অর্থ চেয়েছিল পোশাকশিল্প মালিকদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ। তবে বিজিএমইএর একজন সহসভাপতি জানান সরকারের তরফ থেকে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।

করোনায় বড়সড় ধাক্কা খাওয়ার কারণে বড় লিড টাইমে কাজ দিচ্ছে না বিদেশি ক্রেতা-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্র্যান্ড। তারা কম লিড টাইমের ক্রয়াদেশ দিচ্ছে। ফলে আগামী ছয় মাস পোশাক রপ্তানি কতটা হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। এমন মন্তব্য করে বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক বলেন বর্তমানে ক্রয়াদেশ আসার হার ভালো। পোশাকশিল্প টিকে থাকার লড়াইয়ে এটি সহায়তা করবে।

Pandemic Crisis (COVID-19) and Its Impact on Bangladesh Economy

Being in the corona war, policymakers worldwide are engaged in damage-control of the economic losses at the moment and preparing for confronting the upcoming economic crisis. In addition, there are evidences and indications that financial and banking industries around the globe might have to face remarkable instability in the forthcoming months. Our government has already announced bail-out packages for the recovery. Like, due to cancellation of nearly USD $3 billion worth of work-orders, Bangladesh RMG industry got the attention quickly. Around 2 million workers in the industries may be affected by this and on the other hand, around 4 million people are directly engaged with the RMG sector e.g. backward linkage industries, accessories and packaging factories and transportation sector.

Now, it is high time for the government as well as business enterprises to assess the situation and chalk out a long-term plan to control damage. It is noteworthy to say that, we should not start blame-game now and ask for assistances from the government only due to the limitations and scarcity of resources of different agencies of government. But the prime role of the government should be clear any unwanted obstacles and create opportunities among the economy by the way of sound and clear directives like monetary and fiscal policies as well as tax structure to face the catastrophic situation.

The banking sector is the key player of the economic activities of any countries. As a developing country-we need to be more watchful in terms of planning to get rid out of the impact of COVID-19 outbreak. We are already suffering heavily due to non-performing loans (NPLs) and unfortunately the outbreak may increase the level of NPLs in coming days. The NPLs can be split up in two phases: 1. Pre-COVID NPLs & post-COVID NPLs in view to stare and understand the fact more judiciously. Therefore, a new sets of Bangladesh Bank guidelines need to be initiated addressing the facts. It is pivotal to focus on the early bail-out plans for probable collapse of large loans is essential for sustainability as many backward linkage, SMEs and individuals are directly and indirectly correlated with these Large Loan borrowers. Country's overall economic eco-system is standing on it; we need to make sure that this should not collapse. But it is also true that, it is the peak time for every bank and other non-banking financial organization to assess and reassess their overall lending portfolios and withdraw some of their unnecessary and unwanted portion wisely.

The banking sector will face liquidity pressure as deposit growth and loan recovery also declines. Private sector credit growth might go down during March 2020 to June 2020. Cutting the cash reserve requirement (CRR) by 1% would add approximately inject Taka 130 billion into banking sector liquidity. Other than this Bangladesh Bank has taken some healthy initiatives such as: reduction in repo interest rate, buy-back of government securities, promotion of payment services, refinance scheme BDT 50 billion for agriculture sector at a concessional rate, quarterly repayment for imports under supplier's/buyer's credit, refinance scheme of BDT 30 billion for low income professionals, farmers, micro businessmen, postponement of charging interest on loans, restriction on dividend payment by banks, prohibition of workers lay-off, maximum margin limit for import of child food, relaxations for holding meetings and regulatory reporting. In addition, Bangladesh Bank also relaxed the bar of Advance-Deposit Ratio (ADR) from 83.50 to 87%. Although the financial market especially the banking sector is battered heavily due to regulated cap of rate of interest of deposit and advance very before of this pandemic. Many willful borrowers may resort to take undue advantage of this regulation and the industry may face this in bigger scale amid the pandemic. A threshold may be initiated to identify the genuine sufferers and pass a resolution for safeguarding them only.

But unfortunately if the situation prolongs, at worst, the central bank might consider hefty package to increase money supply but this may have impact on inflation of the country, and can also announce a stimulating fiscal policy considering universal basic income (UBI) approach. But the task of distributing UBI to a large population is dubious, even with the availability of mobile financial services. Therefore a core operational task force may be formed under the direct supervision of the central bank.

Now, if we turn around our eyes to the industrial sector-which is also suffering from the deadly contagious disease. As we all know that, export diversification is always a key for sustainable growth in earning foreign currency but regrettably we are heavily relying of RMG sector. This sector asserts that, 85% of the country's' export earnings come through the RMG sector. We failed to diversify our export basket, thus creating a huge risk in our export portfolios. The response against the outbreak and its impact on the industrial sector is so far admirable, yet this pandemic also poses an economic and humanitarian crisis. The Prime Minister was right to identify this as a challenge and announced an emergency stimulus package of USD $8.5 billion (equivalent to 2.5% of GDP) for bridge financing of the working capital of small and distribute food aid through Bangladesh's existing social safety programs as only 15% of the Bangladeshi population earns over USD $6 a day, and over 90% of the workforce belongs to the informal sector. As Bangladesh Government does not have enough fiscal space to make large stimulus packages due to low tax-to-GDP ratio, the only possible option is monetary expansion — which most developed economies have already deployed.

According to the forecast released by the Economist Intelligence Unit on 26 March, the global economy is expected to contract by 2.2% in 2020. These effects are expected to be more exposed in major G20 economies, such as Germany, Italy, the United Kingdom and the US — all countries that are major markets for Bangladesh's most vital tradable good: readymade garments. The depressed oil prices will also lead to a strong reversal of growth in the Middle East and North Africa region — which is also home to a large Bangladeshi diaspora who send back close to USD $20 billion every year.

In the coming months, there can be no doubt that there will be a decrease in remittances and that these second-degree impacts will also be felt in the country, painfully in rural Bangladesh, where families rely heavily on remittances for their survival.

However, in this critical situation, banks and other NBFIs must take due preparation to accelerate economic recovery in the post-COVID-19 situation where the board and top management have critical role to play. Crisis preparedness would be a key to bring stability. A watch group should be formed for data assessing and make ready the bank & NBFIs for preparing a reliable situational analysis when needed. Strategies need to be proclaimed clearly so that all workforces ensure preparing themselves as effective as well as efficient at this stage for damage-control.

The Impact of Coronavirus on the Global Economy

COVID-19 brought the global economy to a sudden stop, causing shocks to supply and demand. Starting in January 2020, country after country suffered outbreaks of the new Coronavirus, with each facing epidemiological shocks that led to economic and financial shocks as a consequence. How quickly and to what extent will national economies recover after the pandemic has passed? This will depend on success in containing the Coronavirus and on exit strategies, as well as on the effectiveness of policies designed to deal with the negative economic effects of the Coronavirus. The impact of Coronavirus on the global economy will extend beyond 2020. According to forecasts from the International Monetary Fund (IMF) and World Bank, GDP per capita at the end of 2021 is still expected to be lower than December 2019 in most countries. Emerging markets and other developing countries, in addition to facing difficulties in dealing with their own Coronavirus outbreaks, have suffered additional shocks from abroad. In their cases, the new Coronavirus brought a perfect storm. One can foresee a post-Coronavirus global economy marked by higher levels of public and private debt, acceleration in digitization processes, and less globalization.

Bangladesh economy likely to recover soon after pandemic: ADB

Bangladesh economy is expected to recover in the 2020-2021 fiscal year after the Covid-19 outbreak induced slowdown in the 2019-2020 fiscal year, according to the latest Asian Development Bank (ADB) report Asian Development Outlook (ADO) Supplement published on 18 June 2020.

According to a press release issued by ADB, the report forecasts that gross domestic product (GDP) of Bangladesh is expected to grow by 4.5% in the 2019-2020 fiscal year and 7.5% in the 2020-2021 fiscal year. The growth forecast for the 2019-2020 fiscal year reflects sharp decrease in economic activities in the last quarter due to Covid-19 global pandemic and its outbreak in Bangladesh. During the 2020-2021 fiscal year, GDP growth rate is expected to pick up to 7.5% driven by gradual recovery in the first two quarters — followed by quick recovery in the following quarters. These forecasts rest on the assumption that it would take 3 months, from when the outbreak intensifies in the country, for economies to get their domestic outbreak under control and to start normalizing economic activities. These forecasts also consider the impacts of the government's containment actions, and fiscal and monetary stimulus measures, the press release adds.

"After a robust performance in the first nine months of the 2019-2020 fiscal year, Bangladesh economy would slow down in near term due to COVID-19 pandemic but is likely to recover in the 2020-2021 fiscal year. Managing the pandemic is a priority and the FY2021 forecast depends on how the recovery shapes up in the coming months", said Country Director Manmohan Parkash.

Appreciating the resilience of Bangladeshi people, he said, "Global economic recovery, proactive initiatives to attract investments, creating local employment opportunities, and providing easier access to finance for farmers, entrepreneurs and small businesses could help jumpstart the economy". "

ADB has so far provided USD $600 million in loans and USD $1.4 million in grants for managing health emergency and mitigating the initial socio-economic impacts of the pandemic. In the 2020-2021 fiscal year, ADB will continue its strong support to help Bangladesh economy to recover and rebound from the impacts of COVID-19," Mr. Parkash added.

The government's strict containment measures resulted in sharp reduction in consumption, production, and investment in the last quarter of the 2019-2020 fiscal year. Sweeping global spread of COVID-19 and containment measures in major export markets sharply reduced export earnings. Economic activities are expected to slowly return towards a normal path after restrictions are gradually lifted by the government since June 2020.

In the 2020-2021 fiscal year, gradual recovery is expected to start from the first quarter, aided by the government's stimulus measures in the absence of the recurrence of COVID-19 outbreak. Afterward, strong manufacturing base and recovery in global economy will enable Bangladesh to experience a quick recovery. However, risks to the outlook are tilted downward including a prolonged or recurrence of COVID-19 outbreak in Bangladesh and export destinations.